স্টুডেন্টস্ হেলথ হোমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

হেলথ হোম

অক্টোবর ২০২১

জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস

ডাঃ তাপস কুমার ঘোষ

আমাদের দেশে ১৯৭৫ সালের পয়লা অক্টোবর থেকে প্রতি বছর 'জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস' পালন করা হচ্ছে। Indian Society of Blood Transfusion and Immuno-haematology সংস্থার উদ্যোগে প্রথম 'জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস' পালন করা হয়। Transfusion and immunohaemetology সংস্থা ১৯৭১ সালের বাইশে অক্টোবর Mrs. K. Swaroop Krishan এবং Dr. J. G. Jolly-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। এই সংস্থা প্রথম থেকেই নিরাপদ রক্তদানের বিষয়ে সকলকে সচেতন করতে থাকে। আর এটাও সবাইকে বোঝাতে থাকে যে একমাত্র স্বেচ্ছা রক্তদানের মাধ্যমে নিরাপদ রক্তদান সম্ভব।

Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis, Malaria প্রভৃতি অনেক রোগ একজনের রক্ত থেকে অন্য জনের রক্তে, রক্তদানের মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। তাই সুস্থ মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করলে, গ্রহীতার শরীরে স্বাস্থ্যকর রক্তের প্রবেশ ঘটে। পেশাদারী রক্তদাতাদের শরীরে বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা থাকে এবং রক্তের গুণাগুণ যথাযথ থাকে না। তাই রক্তদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা রক্তদান জরুরী। একজন সুস্থ মানুষ তিন মাস অন্তর একবার রক্ত দিলে, তার শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। স্বাভাবিকভাবে তার শরীরে তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তা পূরণ হয়ে যায়।

আমাদের দেশে পয়লা অক্টোবরকে 'জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবস' রূপে পালন করা হয় Dr. Jai Gopal Jolly কে শ্রদ্ধা জানিয়ে (1st Oct 1926 - 5th Oct 2013)। আমাদের দেশের এই শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক PGI Chandigarh এর Department of Transfusion Medicine এর Emeritus Professor ছিলেন। স্বেচ্ছা রক্তদানের বিষয়ে আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। ওনাকে বলা হয় 'Father of Transfusion Medicine in India'.

Prof. Jolly আমাদের দেশের 'Blood Transfusion and immunohaematology' সংস্থার Founder President ছিলেন। Thalassaemia নিবারণে বিয়ের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর blood screening এর প্রবক্তা ছিলেন। Blood transfusion এবং Haemophilia নিয়ে তার কাজ World Health Organisation (WHO) এর স্বীকৃতি পায়। উনি পেশাদারী রক্তদানের বিপদ সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করেছেন, যা শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অনুমোদন পেয়েছে। তাই জাতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অনুমোদনে আমাদের দেশে পয়লা অক্টোবর 'জাতীয় রক্তদান দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

'জাতীয় রক্তদান দিবস' আমাদের সচেতন করে, রক্তের ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে। শুধুমাত্র আত্মীয় ও বন্ধুদের জন্য রক্তদান নয়, যে মানুষের জীবনের জন্য রক্তদান প্রয়োজন, তাদের জন্য রক্তদান করা দরকার। মানুষের প্রয়োজনে মানুষ রক্তদান করলেই, নিরাপদ রক্তদান সম্ভব। আমাদের দেশে ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্র এ বিষয়ে এগিয়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী, শতকরা ৯৩ (তিরানব্বই) ভাগ রক্তপ্রদান, স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের মাধ্যমে হয় ত্রিপুরায় আর সবচেয়ে পিছিয়ে মণিপুর। তাই 'জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদান দিবসে'র প্রয়োজন আছে, এ বিষয়ে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলোকে সচেতন করার জন্য। আঠারো থেকে ষাট বয়সী মানুষ, যাদের ওজন পঁয়তাল্লিশ কেজির ওপরে এবং যাদের রক্তবাহী কোনও রোগ নেই, তাদের সবাই যদি বছরে অন্ততঃ একবার করে রক্তদান করে তবে তাদের শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু এই রক্তে অন্য মানুষ, যাদের জীবনের জন্য রক্ত দরকার, তাদের জীবন রক্ষা পাবে, নিরাপদ রক্ত গ্রহণ করে।

৮ সেপ্টেম্বরের ঐতিহ্য ও সামাজিক দায়িত্ব

অনুপ সরকার

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনে '৮ সেপ্টেম্বর' চিহ্নিত হয় ১৯৬৫ সালে শিক্ষামন্ত্রীদের বিশ্ব সম্মেলন থেকে। পরের বছরে অক্টোবর মাসে এই পরিকল্পনা স্বীকৃতি পায় এবং সেই অনুসারে ১৯৬৭ থেকে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালন হয়ে আসছে দেশে দেশে। এদিকে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৭ সালে এই দিনটিতেই পথচলা শুরু বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত সাক্ষরতা আন্দোলন। অর্থাৎ ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ আমাদের কাছে ৫৫ তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ও রাজ্যে সংগঠিত সাক্ষরতা আন্দোলনের ৩৫ তম সূচনা দিবস। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য - দেশ পরিচালকমন্ডলী ও দেশবাসীকে মর্যাদা ও মানবাধিকারে বিষয়ে সাক্ষরতার গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যে গুরুত্ব নিহিত আছে 'সকলের জন্য শিক্ষা'-র প্রাসঙ্গিকতায়; কারণ সর্বসাধারণের সাক্ষরতা সুনিশ্চিতকরণ সার্বজনীন শিক্ষার অন্যতম পূর্বশর্ত। 'সকলের জন্য শিক্ষা'-র দাবি নতুন নয়; ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এই দাবির উদ্ভব শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গড়ার তাগিদ থেকে। উনিশ শতকে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ ব্যাক্তিত্বের শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ গড়ার ভাবনা থেকে উদ্ভূত সকলের জন্য শিক্ষার কর্মযজ্ঞের গৌরবজনক ইতিহাস আমাদের জানা আছে। যার উত্তরাধিকারী হয়ে একথা বলাই যায় — সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচী ও নীতিপ্রণয়ন কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়; সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সর্বজনীন শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যাবে সকলের শিক্ষার প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে কার্যকর হয়েছে শিল্প বিপ্লবের যুগে ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণকালে। শিল্প বিপ্লবের যুগে কলকারখানায় উপযুক্ত মানের শ্রমিক পাওয়ার স্বার্থে কলকারখানা বা পুঁজির মালিক চেয়েছিল অবৈতনিক শিক্ষার বিস্তার। মূলত ইংল্যান্ড ও ইউরোপের মধ্যে এই উদ্যোগ আমরা দেখতে পাই এবং এর প্রভাব ঔপনিবেশিক শাসনের দেশগুলিতে অল্পবিস্তর পড়েছিল যেমন - রাজা রামমোহন রায়ের যুগে ও পরবর্তী পর্যায়ে বিদেশী শাসকগণের শাসন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে শিক্ষা বিস্তারের কিছু কিছু পদক্ষেপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল বৃটিশ ভারতে। কিন্তু সবটাই ছিল পুঁজিপতি ও বর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার বিষয়। প্রায় দেড়শ বছর পরে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে পুনরায় সর্বসাধারণের মাধ্যমে শিক্ষার দাবি বা রাষ্ট্রীয় উদ্‌যোগ পরিলক্ষিত হয়। রুশ বিপ্লবের সাফল্য ও তার অগ্রগতির ফলে শিক্ষার সুযোগ ক্রমান্বয়ে পর্যবসিত হয় শিক্ষার অধিকারে। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের এই দুই অবস্থানের মধ্যে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিংশশতাব্দীর সূচনা পর্ব থেকে মুক্তিকামী মানুষের জন্যে মুক্তিকামী শিক্ষার বাস্তবতাকে সমাজ প্রগতির কারিগররা শুধু গ্রহণ নয়, বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং মানুষকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার প্রশ্নে আমরা দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিচিত।

সমাজ বাস্তবতার নিরিখে শিক্ষার অগ্রগতির সত্ত্বেও, এখনও বিশ্বে কমপক্ষে ৭৭.৩ কোটি তরুণ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মৌলিক সাক্ষরতার দক্ষতায় অভাব রয়েছে; যেখানে দেশের পরিস্থিতিতে প্রায় ২৫ কোটি মানুষ সাক্ষরতা মানের নিচে অবস্থান। এই পরিসংখ্যান দিয়ে অবস্থার গভীরতা পরিমাপ করা যাবে না; বস্তুত বিংশশতাব্দীতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবলুপ্তি যা ত্বরান্বিত করেছে এক মেরু বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়, মুক্তিকামী মানুষের স্বার্থে মুক্তিকামী শিক্ষার উপরে এক বড়ো আঘাত। এই আঘাত সর্বজনীন শিক্ষার দাবিকে নস্যাৎ করার পাশাপাশি শিক্ষার গুণগতমানকে বিপরীত লক্ষ্যে অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পর্যবসিত করেছে বাজারমুখীনতায়। ফলত আমাদের চারপাশে শিক্ষা বিস্তারের যে চিত্র আমরা দেখতে পাই, তা প্রকৃত শিক্ষার এক বিকৃত রূপ।

এবারে, ৮ সেপ্টেম্বরের ঐতিহ্যের দিকে কিছুটা আলোচনা করা যাক - ১৯৪৫ সালে বিশ্ব সংস্থা (ইউ.এন.ও) গড়ে ওঠে বিশ্বের দেশসমূহের সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা এবং সমাধানের রাস্তা অনুসন্ধানের স্বার্থে। ১৯৪৫ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিসমাপ্তির বছর, প্রায় ৭৫ কোটি মানুষ যা বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ ঔপনিবেশিক শাসনে তখনও বন্দী। যুদ্ধোত্তর পর্বে ধ্বংস-মৃত্যু-অভাব-অনটন জর্জরিত বিশ্বকে নতুন ভাবে নির্মানে তৎপরতা চলেছে চতুর্দিকে। দেশে দেশে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যে ঔপনিবেশিক শক্তির পরাজয়ে সদ্যস্বাধীন দেশগুলিতে যুদ্ধক্লান্ত মানুষ নিজ মাতৃভূমি ও পিতৃভূমির উন্নয়নে মগ্ন; খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পরিবেশ, কর্মসংস্থান ইত্যাদির উন্নয়নে বিশ্বজুড়ে সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ গঠনের তীব্র চাহিদার সামনে বিশ্বসংস্থার সদস্য দেশসমূহের পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল সময়ের বাধ্যবাধকতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দামামা থেমে গেলেও এটা ভাবার কোনো অবকাশ ছিল না যে রাষ্ট্রনায়করা দৃষ্টিভঙ্গী পালটে মুক্তিকামী মানুষের স্বার্থে একই অভিমুখে অবস্থান করছে বা করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থানে ভূ-গোলোকে ঠান্ডাযুদ্ধের বাতাবরণ মুক্তিকামী মানুষের লড়াই সংগ্রামে জুগিয়েছিল অসীম সাহস ও মানসিক শক্তি; যার ভিত্তি ছিল বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বসংস্থার পরিচালন অভিমুখ তৎকালীন পরিস্থিতি দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত থাকত ধরে নেওয়া যায়। বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ নির্মাণের পাশাপাশি দারিদ্র, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা ইত্যাদি দূরীকরণের প্রশ্নে পরবর্তি কয়েক দশক জুড়ে 'ইউ এন ও' ও 'ইউনেসকো'র বলিষ্ঠ ভূমিকা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে শ্রেণীবৈষম্যের সমাজে সর্বজনীন শিক্ষা প্রসার বা নিরক্ষরতা দূরীকরণের অন্যতম শর্ত দারিদ্র ও অপুষ্টির অবসান; কারণ সামাজিক এই ব্যাধিগুলি একে অপরে শিকলের মতন সম্পর্কযুক্ত। স্বাভাবিক ভাবে অস্ত্র যুদ্ধের পরিবর্তে দারিদ্র ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুক্ত দেশগুলিকে।

এরপর ২য় পাতায়

সম্পাদকীয়

তৃতীয় ঢেউ কি চলে গেল? কে জানে! কিন্তু ঢেউ-এর পর ঢেউ এ ভেসে গেল আমাদের অনেক মানব সম্পদ। মহামূল্যবান রথী মহারথী থেকে রাষ্ট্রের চোখে মূল্যহীন বহু পরিযায়ী জীবন। কেউ গেলেন পাঁচতারা হাসপাতালের বিছানায়, বহু ব্যবস্থা সত্ত্বেও বুকের মধ্যে পর্যাপ্ত হাওয়া ঢোকার অভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে আর কেউ গেল সড়ক, রেলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে খিদে ক্লান্তি আর নিদারুণ অবহেলায়, এমনকি ক্লান্তির ঘুমের মধ্যে রেলের চাকায় পিষে গিয়েও।

আর ভেসে যেতে বসেছে শিক্ষাদীক্ষার রেওয়াজ। কোথাও অনলাইন পিষ্ট হয়ে কোথাও নিছকই চরম দারিদ্যের মোকাবিলায়। আশার কথা অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর শিক্ষাঙ্গন আবার খুলছে। কত দিনের জন্য কেউ জানে না। তবু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। দুবছর বিদ্যালয় আঙিনার বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মন বসানো কোনো সহজ কাজ নয়। বিশেষত প্রান্তিক মানুষের ক্ষেত্রে, যেখানে এই চরম দুঃসময়ে, কর্মক্ষম হওয়া মাত্রই পরিবারের স্বাভাবিক প্রয়োজন থাকবে শিশুদেরও উপার্জনের কাজে লাগানো। এই সমস্যা শিক্ষক সমাজ ও সমাজের অন্যান্য আলোকিত মানুষ জন যদি সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করতে পারেন তবে নিশ্চয়ই আবার সত্যিকারের সুসময় ফিরবে। অন্যথায় সুখী ভারত আর অসুখী ভারতের বিভাজন আরও প্রকট হবে। আর সেই বিভাজনের গভীর খাদে সব সুখ যে কোনো দিন তলিয়ে যেতে পারে, যেকোনো কারও।

জাতীয় স্বেচ্ছা রক্তদিবস..... ১ম পাতার পর

আর এই কাজে বিশ্বসংস্থার উল্লেখজনক ভূমিকা ও বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সামাজিক অগ্রণী অবস্থানের পটভূমিতে ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষাবিষয়ক বিশ্বসম্মেলন, যা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের এই ঐতিহাসিক অবস্থানের সাথে আমাদের মনে রাখতে এক ঐতিহাসিক ঘটনাকে - ১৯৪৫ সালে সদ্যস্বাধীন ভিয়েতনাম রাষ্ট্রে প্রথম তিনটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মধ্যে ছিল পিতৃভূমিকে নিরক্ষরতামুক্ত করার ঘোষণা। ওই সময়কালে পৃথিবীর নানাপ্রান্তে মুক্তিকামী মানুষের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনার মাঝে আমাদের দেশেও প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনার ছাপ প্রতিফলিত হয়েছিল সংবিধান প্রস্তুতকরণে; সংবিধানে লিপিবদ্ধ হল বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা। সর্বসাধারণের শিক্ষার বিষয়টি দেশ গড়ার অন্যতম শর্ত মেনে নিতে কোন ভিন্ন মত ছিল না।

এখন এই গৌরবজনক ঐতিহ্য বর্তমান সমাজ কতখানি ধারণ করতে পারছে বা বহমান ঐতিহ্যের প্রতি সমাজ কতখানি দায়বদ্ধ থেকেছে, তার যথার্থ মূল্যায়ণই হবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা। সেখানে কোটি কোটি মানুষের দারিদ্র, ক্ষুধা ও অপুষ্টির সাথে নিরক্ষরতার অন্ধকার বহমান ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতার পালনের নির্দশন না। কিন্তু সমাজ প্রগতির একটি অংশ সর্বকালেই সক্রিয় থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে। সেই দায়িত্ববোধের তাগিদে ১৯৮৭ সাল থেকে এই রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে সাক্ষরতা, সচেতনতা, সক্ষমতা আন্দোলনের ধারা। আন্দোলনের চৌত্রিশ বছর অতিক্রমকালে বিদ্যাসাগরীয় ভাবনা আজও প্রাসঙ্গিক যে, মুক্তিকামী মানুষের জন্যে চাই মুক্তিকামী শিক্ষা, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপক প্রসারেই সম্ভব সমাজের সার্বিক বিকাশ। ফলতঃ ঐতিহ্যবাহী ৮ সেপ্টেম্বর শুধুমাত্র শপথ ও স্তুতি বাক্য পাঠের দিনে নয়; সমাজের অগ্রণী অংশের কাছে শোষণ-বঞ্চণা থেকে মুক্ত করার কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার দিন এবং এটাই সমাজের অগ্রগামিনতার যুক্তিনির্ভর চিন্তা-ভাবনা।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই যুক্তিনির্ভর চিন্তা-ভাবনা কতখানি বাস্তবসম্মত তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু যে ঐতিহ্যের পতাকা রাজ্যের সাক্ষরতা আন্দোলন বা বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি বহন করছে, তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না। যদি কোন সংশয় অন্তরে তৈরি হয়, তা হলে বুঝে নিতে হবে যে মানব সভ্যতার বিকাশের সামাজিক-বৈজ্ঞানিক সত্যতা স্বীকারে সংশয় গ্রাস করছে আমাদের মনকে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও হারিয়ে যায় না সমাজ পরিবর্তনের মহান কর্মযজ্ঞে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ভূমিকা। বিশেষ করে আজ করোনা জীবাণুর আক্রমণে জনজীবন প্রবল সংকটের সম্মুখীন; বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নিরক্ষরতা ও বিদ্যালয়চ্যুত পড়ুয়া সংখ্যা ইতিমধ্যে যা আমাদের আছে, তার সাথে আতিমারিজনিত কারণে যুক্ত হবে আর অনেক মানুষ। অনেক প্রতিবন্ধকতার সামনে যে পরিবারগুলি সরকারপ্রোষিত বিদ্যালয় শিক্ষাকে অবলম্বন করে সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিল, এই অতিমারি সময়কালে বিদ্যালয় শিক্ষা সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার সুবাদে বহুসংখ্যক পড়ুয়া কোনভাবেই তাদের অভ্যাস বজায় রাখতে পারছে না; কিশোর -কিশোরীদের কলম ধরা হাত পরিণত হচ্ছে শক্ত শুষ্ক হাতে। বিশেষ করে পরিবারগুলির জীবনযাপনের রকম পালটে যাওয়ায় পরিবেশ স্বাভাবিক হলেও বিদ্যালয় ছুট সংখ্যার বহুগুণ বুদ্ধি হবে এবং নিরক্ষরতার বোঝা বাড়বে।

ইউনেসকোর তথ্যানুসারে অতিমারিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বিশ্বে প্রায় ১১০ কোটি পড়ুয়া বিদ্যালয়ের বাহিরে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রায় ৩২.৭ কোটি এবং তার মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় ১৪ কোটি শিশু-কিশোর -কিশোরী বিদ্যালয় শিক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। বিশ্ব সংস্থার পূর্বাভাষ, এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৩৩ শতাংশ আগামী দিনে আর বিদ্যালয় শিক্ষায় যুক্ত হবে না।

এই পরিস্থিতির মধ্যে গোদের ওপর বিষফোঁড়া স্বরূপ চাপিয়ে দেওয়া হল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০। একটা নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি দরকার ছিল এবং তা আরো আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। ১৯৮৬ থেকে ২০২০-র মধ্যে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি দরকার ছিল এবং তা আরো আগেই হওয়া উচিৎ ছিল। ১৯৮৬ থেকে ২০২০-র মধ্যে প্রচলিত শিক্ষানীতি একবার পরিমার্জিত হয়েছে (১৯৯২); কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছরের দাবি, আন্দোলন, আইনী লড়াই করে জাতীয় সরকারকে 'শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯' গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই শিক্ষানীতি গ্রহণ করবে যেখানে 'শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯' যথাযথভাবে কার্যকর থাকে। কিন্তু আমরা কী দেখলাম অতিমারি কালে আলোচনার সুযোগ খর্ব করে দ্রুততার গুরুত্ব নেই; এমনকি কোভিড পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়শিক্ষাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে নুন্যতম আগ্রহ না দেখিয়ে, শিক্ষাব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের গোপন পথের নীতি নির্ধারণ করেছে। খুব পরিষ্কার করে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা অধিকার আইনের প্রয়োগ চায় না; বরং আরো এগিয়ে শিক্ষাকে যেনতেন প্রকারে সর্বসাধারণের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

এরকম কঠিন সময়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনে আমাদের দায়িত্ব মানুষের অর্জিত অধিকারকে রক্ষা করা এবং পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিরোধী নীতির পরিবর্তনের দাবিকে সর্বসাধারণের দাবীতে পরিণত করার আন্দোলন গড়ে তোলা। আমাদের চারিপাশে অনেক অনেক বিদ্যাসাগর শিক্ষা কেন্দ্র, অসময়ের পাঠশালা, অন্য শিক্ষা, বিকল্প শিক্ষা ইত্যাদি যে নামেই হোক শিক্ষা কেন্দ্র চলছে। কেন্দ্রগুলি হোক মানুষের মনে প্রশ্ন তৈরী করার আঁতুর ঘর; সেই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে মিলবে সাক্ষরতা আন্দোলনের যথার্থ নীতির সন্ধান। '৮ সেপ্টেম্বর' প্রকৃত অর্থে যুক্ত হবে সর্বজনীন শিক্ষা আন্দোলনে, আজ সেটাই আমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্য সময়।

১-৭ই সেপ্টেম্বর পুষ্টি বিধান সপ্তাহ

লুৎফুল আলম

১লা থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর, '২১ জাতীয় পুষ্টি বিধান সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হবে সারা দেশব্যাপী। প্রত্যেক মানুষকে স্বাস্থ্যবান ও সুস্থ রাখার জন্য প্রোটিনযুক্ত আহার যোগানের গ্যারান্টি করতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে সচেতন হতে হবে তারা যাতে সঠিক খাদ্যাভ্যাস তৈরী করে এবং তাদের শরীর যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে সেদিকে লক্ষ্য রাখে। প্রত্যেক বছর জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়, নানান ধরনের আলোচনা সভা বা প্রদর্শনী করা হয় যাতে করে, মানুষকে সচেতন করা যায় যে তারা যেন এমন সব খাদ্য গ্রহণ করে যেটার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা হবে।

প্রতি বছর জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার জন্য এক একটি বিষয় নির্বাচন করা হয়। এই বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে বিষয়বস্তু নির্বাচন হয়েছে — "Feeding smart right from the start" অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকেই সঠিক খাদ্য গ্রহণ করো। এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যাতে করে মানুষ এমন সব খাদ্য গ্রহণ করে যার ফলে তারা সুস্থ ও সবল থাকে।

১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার চিন্তা মাথায় আসে আমেরিকার ডায়াবেটিক এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে। এটা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের ধারণা পৌঁছে দেওয়া। এই উদ্যোগকে পৃথিবীর বহুদেশের মানুষ সমর্থন যোগায় এবং ১৯৮০ শেষভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটা জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৮২ সাল থেকে ভারতবর্ষে পুষ্টি সপ্তাহ পালন শুরু হয়। এই পুষ্টি সপ্তাহ পালন করার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মানুষকে সচেতন করে সুখাদ্যাভ্যাস সৃষ্টি করা যাতে করে তারা সুস্থ ও সবল থাকতে পারে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে।

পুষ্টি হল মানুষের শরীরের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য এই পুষ্টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীবনের শুরু থেকেই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ খাবারের খুব প্রয়োজন। শারীরিক বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মানসিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য পুষ্টি অপরিহার্য। সঠিক পুষ্টি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পারলেই হবে জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ পালনের স্বার্থকতা।

একটি স্বাস্থ্যকর শরীর শুধু সুস্থ থাকতে নয়, বরং প্রাণবন্ত থাকতেও সাহায্য করে। পুষ্টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে এবং এই চক্রটি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি সুষম এবং পুষ্টিকর খাদ্য অপরিহার্য্য। এই সব বিষয়ে দেশের মানুষকে অবহিত করার জন্য এবং মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের খাদ্য ও পুষ্টি বোর্ড জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহের এই সপ্তাহব্যাপী বার্ষিক উদ্‌যাপন পরিচালনা করে। এটি মানবদেহের সঠিক পুষ্টির তাৎপর্য এবং কার্যকরিতার উপর জোর দেয়। গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি সুষম খাদ্য সঠিক কার্যকারিতা এবং বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পুষ্টি কি ও তার প্রয়োজনীতা ঃ

জীবের একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া হল পুষ্টি। এটি এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব খাদ্য গ্রহণ করে, হজম করে, শোষণ করে পরিবহন করে এবং শোষণের পরে খাদ্য উপাদানগুলো দেহের সকল অঙ্গের ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের পুনর্গঠন ও দেহের বৃদ্ধির জন্য নতুন কোষ গঠন করে।

যে প্রক্রিয়া খাদ্য খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙ্গে সরল উপাদানে পরিণত হয়ে দেহে শোষিত হয় তাকেই পুষ্টি বলে। সবারই প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সকল উপাদানের সাথে সুষম পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা জরুরী। কারণ

এরপর ৩য় পাতায়

শিক্ষক দিবসের চিঠি

চন্দন নস্কর

শ্রদ্ধেয় বিডি স্যার,

আমার প্রণাম নেবেন স্যার।

এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবে কিনা জানিনা, এখন তো স্কুল বন্ধ। তবু একটা কথা আপনাকে বলবো বলেই লিখতে বসলাম। বানান ভুল হলে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার ফোন নম্বরটা কিছুতেই জোগাড় করতে পারিনি। সুকোমল দেবে বলেছিল কিন্তু দেয়নি।

অনেকদিন হয়ে গেল আমি কিছু লিখিনি, পড়িনি, অঙ্কও করিনি। বই খাতাও কিছু আমার সাথে নেই। আমি এখন যেখানে থাকি সেখানে একটা ছোট্ট ঘরে আমরা চারজন থাকি। সকাল থেকে উঠে মেশিন চালাই। দুপুরে খেতে যাই একবার। সন্ধ্যাবেলা টিভি দেখতে যাই রাস্তার ওপারে সুবল কাকার দোকানে। সুবল কাকা আমাকে খুব ভালোবাসে।

স্যার এ বছর কি শিক্ষক দিবস পালন হবে স্কুলে? কী করে হবে? স্কুল তো বন্ধ! অনলাইনে অনুষ্ঠান করবেন? তাহলে তো আর আমি আবৃত্তি করতে পারবো না। আমি অবশ্য এমনিও আর স্কুলে যেতে পারবো না। আমি তো এখানে কাজ করি। এরা আমাকে খুব ভালোবাসে, আমি ভালো হিসেব করতে পারি বলে।

জানেন তো স্যার, যখন লকডাউনের দ্বিতীয় মাসে বাবাকে দোকানের মালিক আর মাইনে দিতে পারবে না বলে যেতে মানা করল সেদিন বাবা আমাদের কাউকে কিছু বলেনি। পরের দিন সকালে মা আমাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে বলল – আর কত ঘুমোবি? এতবড় হয়ে গেলি এবার কাজকম্ম কর, রোজকার না হলে সংসার চলবে কী করে? বাবার সুগারের ওষুধ শেষ।

আমি ঘুম চোখে উঠে বই খাতা নিয়ে বসেছিলাম অঙ্ক করব বলে। কী জানি কি হলে? সেদিন একটাও অঙ্কের উত্তর মিলল না।

দুপুরে মা আবার একই কথা বলল। বাবা বলল – থাক না, ওকে আবার এসবের মধ্যে কেন? ও মাধ্যমিকটা অন্তত পাশ করুক।

মা বলল – কি হবে? ওই তো কুমুদের দুটো ছেলে কেমন রোজগেরে হয়েছে। ওরাও তো ইস্কুলে যায় না।

সপ্তাহখানেক পরে পাড়ার এক কাকার সাথে গ্রাম থেকে তিনঘন্টা বাসে চেপে সুবল কাকার দোকানে চলে এলুম। গেড্জি কারখানায় এরা আমাকে দিনে দু'শো টাকা রোজ দেয়। তিরিশ গুণ দু'শো, মানে ছয় হাজার টাকা। আমাদের সংসার আবার আগের মত চলবে স্যার। তবে আমি মাকে বলেছি রিংকিকে যেন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে দেয়। রিংকিকে আপনি চেনেন তো – আমার বোন। সেই যে আপনি যখন স্টেশন থেকে সাইকেলে করে স্কুলে যেতেন তখন পুকুর পাড়ে যে মেয়েটাকে রোজ ছিপ ফেলেতে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন কি মাছ ধরলিরে? সেই আমার বোন রিংকি। এখন সে সিক্সে পড়ে। ওদেরও অনলাইন ক্লাস হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তো স্মার্টফোন নেই। আর প্রায় দিনই কারেন্ট থাকে না। সেজন্য ওরও ক্লাস করা হচ্ছে না। তবে ও খুব ভালো পড়াশোনায়। স্কুল থেকে যে একটিভিটি টাস্কগুলো দিয়েছেন সেগলো সব ও একাই করেছে। মা জমা দিতে গেছিল। দিদিমণিরা ওর খুব প্রশংসা করেছে। মা বলছিল দিদিমণিরা অন্যদের বলেছে টাস্ক ঠিকমতো জমা না হলে মিড ডে মিলের চাল আলু বন্ধ করে দেবে। এটা কি ঠিক স্যার? খাবার সঙ্গে লেখা পড়ার কী সম্পর্ক?

আপনি তো নতুন জামা কাপড় পরে সাজেন না খুব একটা। কিন্তু অন্য স্যার, ম্যাডামরা এবারে শিক্ষক দিবসে আগের মতো খুব সাজবেন, তাই না। আপনার ওই গান কিন্তু আমার সারাজীবন মনে থাকবে স্যার। কী ভালো গান আপনি। কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো। আমি অনেকবার গানটা গাইবার চেষ্টা করেছি, পারিনি স্যার। আজ শিক্ষক দিবসে আমি দূর থেকে সব টিচারদের প্রণাম জানাই। আপনারা না থাকলে আমরা এতকিছু শিখতে পারতাম কি?

এই দেখুন, যে কথাটা বলব বলে আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম সেটাই বলা হল না। আমাদের ক্লাসের বিট্টু বিয়ে করেছে স্যার। সকলে ধরে আমাদের গার্লস স্কুলের কমলার সাথে ওর বিয়ে দিয়েছে। একদিন নাকি কমলা বিট্টুর সাইকেলে করে নদীর চরে ঘুরতে গেছিল। বাড়ি ফিরে নাকি ইস্কুলের ব্যাগে জামা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। কমলার মা জানতে পেরে হাতে নাতে ধরে খুব মারধোর করেছে। কমলার বাবা আর বিট্টুর কাকার মধ্যে সে কি ঝামেলা! শেষে পার্টির লোকেরা মিটিং করে ওদের বিয়ে দিয়েছে। বিট্টু একটা রিক্সা কিনেছে। কমলার বাবাই দিয়েছে নাকি। গার্লস স্কুলের বড়দি খবর পেয়ে এসেছিলেন, বলেছিলেন এইটের মেয়ের বয়স চোদ্দো বছর তাই এই বিয়ে বেআইনী। কমলার বাবা দিদিমণিকে ঘরে ঢুকেত দেয়নি।

আচ্ছা স্যার, ইস্কুল কি আর কোনোদিন খুলবে না? এবারে কি মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে? আমি কি স্যার পরীক্ষা দিতে পারবে? কিন্তু আমি স্কুলে যাবো কী করে? কাজ করতে করতে কি পড়া যায় স্যার? ভাবছি এ মাসের মাইনের টাকা দিলে একটা ভালো ফোন কিনবো। তখন আপনাকে ফোনে দেখতে পাবো। আপনি আমার ফোন ধরবেন তো স্যার?

একটা কথা বলবো স্যার? আপনি একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন? আমার মাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন? বাবাকে আমি জানি। দোকান খুললেই আবার বাবাকে ডাকবে। আমাদের টাকার সমস্যা হয়তো মিটে যাবে। কিন্তু স্কুলে যাওয়া একবার বন্ধ হয়ে গেলে, আমি পরীক্ষাটা না দিলে আমার পড়াশোনাটাতো বন্ধ হয়ে যাবে তাই না। স্যার আমি মাধ্যমিক পরীক্ষাটা দিতে চাই। এবারে স্কুলে ফার্স্ট হবে সুকোমল। আমি শুধু পাশ করতে চাই স্যার। আমি পড়াশোনা করতে চাই স্যার। আপনি যেদিন আসবেন আমি সেদিন কাজের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাবো। আপনি আসবেন তো?

ইতি

বিনীত

আপনার স্নেহের ছাত্র

কার্তিক বিশ্বাস

দশম শ্রেণী, রোল নম্বর ১

১–৭ই সেপ্টেম্বর পুষ্টি বিধান ..... ২য় পাতার পর

পুষ্টিকর খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

কোভিড মহামারিতে সুস্থ থাকা জরুরী ঃ

সঠিক খাদ্যাভ্যাসই কোভিডকালে এই কঠিন সময়ে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোন খাদ্য আমরা খাব, কোন খাদ্য আমরা বর্জন করব তা আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

পৃথিবীতে করোনা ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই মানুষ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়েছে। পুষ্টি সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হল একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য রুটিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদনগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা। খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ যা প্রধানত আমাদের সারা দিনের খাবার থেকে আসে। সঠিক খাদ্যাভ্যাসই কোভিডকালের এই কঠিন সময়ে আমাদের শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানুষের শরীরে একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেম গঠনের জন্য সুষম খাদ্য এবং ব্যায়াম গুরুত্ব পূর্ণ।

কোভিডকালে কি কি খাবার খাওয়া উচিৎ এবং নিজেদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে গেলে আমাদের খাদ্য তালিকায় কি কি থাকা বাঞ্ছ্যনীয়

তাজা ফল এবং শাকসব্জি খেতে হবে — ফল এবং শাকসব্জী ভিটামিন এবং খনিজগুলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাক-সবজি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে শরীরে আয়রনের অভাব হবে না। এ ছাড়া তাজা ফল এবং শাকসবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার যা পরিপাকতন্ত্র বা আমাদের হজমের শক্তি ভাল রাখতে ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে ঃ—

ডাল, মাছ এবং দুধের মতো জিনিষ (প্রোটিনের খুব ভাল উৎস)। প্রোটিন হাড় মজবুত করতে সাহায্য করে এবং আমাদের শরীরের পেশিগুলিকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু দৈনন্দিন খাবারে প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করলে অল্প খাবারেই পেট ভরে যায়, ফলে জাঙ্কফুড খাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। ফলে, এমনিতেই আমাদের শরীর সুস্থ থাকে।

বাদাম ও বীজ জাতীয় খাবার খেতে হবে ঃ—

বাদাম এবং বীজে স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইবার, ভিটামিন, প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ থাকে। এদের মধ্যে যে অসম্পৃক্ত চর্বি বা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে, সেগুলো হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ভিতরে ও বাইরে আর্দ্র থাকতে হবে ঃ—

স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পানীয় জল। জল রক্তে পুষ্টি এবং যৌগ পরিবহন করে। একই সঙ্গে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রতিদিন নিয়ম করে, প্রচুর পরিমাণে জল পান করতে হবে। যদি পর্যাপ্ত জল পান না সম্ভব হয়, তাহলে কিছু সাইট্রাস বা রসালো ফল, যেমন লেবু এবং কমলালেবুর রস করে বা এমনি রোজ খেতে হবে। এটি শুধু আমাদের জিভে স্বাদই যোগ করবে না, পুষ্টিগুণও বাড়াবে।

গুড় একটি পুষ্টিকর খাদ্য ঃ—

খাদ্যতালিকায় চিনির বদলে গুড়কে বেছে নিন। কারণ এতে অধিক পুষ্টিকর উপাদান উপস্থিত। গুড়ে উপস্থিত মোলাসেস একে আরও পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ করে তোলে। গুড়ে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ থাকে। গুড় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে থাকে এবং সর্দি কাশি থেকে শরীরকে নিরাপত্তা প্রদান করে। গুড় খেলে হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়, অ্যানিমিয়া রোধ করা যায়। এর সাহায্যে লিভারের ডিটক্সিফিকেশান সম্ভব হয়। রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে ভালভাবে কাজ করতে সাহায্য করে গুড়ে উপস্থিত উপাদান। গুড়ে ৭০ শতাংশের বেশী সুক্রোস থাকে এবং এতে আইসোলেটেড ফ্রুকটোস ও গ্লুকোজ থাকে ১০ শতাংশেরও কম, এমনকি খনিজ থাকে ৫ শতাংশ।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মসূচী

কোলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্র

মৌলালী মূল ভবন থেকে নতুন ঠিকানা – মধ্য কলকাতা স্থিত ১বি, মদন মিত্র লেনে এই কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। বিগত ২৭ শে অক্টোবর ২০২১ সালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ডা. পবিত্র গোস্বামী সহ কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য, মেডিক্যাল সম্পাদিক ডাঃ সুরূপা দাশগুপ্ত, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য শ্রী সঞ্জয় ব্যানার্জী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও বিভিন্ন সদস্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ২৮ অক্টোবর এখানে ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিন উপলক্ষে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ২৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ স্থানীয় মানুষ রক্তদান করেন।

১৮ নভেম্বর ২০২১, আনন্দ মোহন কলেজে একটি 'কোভিড স্যানিটাইজেশন প্রোগ্রাম' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সঞ্জীব মিত্র (এমিনেন্ট ডেন্টাল সার্জেন), আঞ্চলিক কেন্দ্রের সভাপতি সহ উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য মহাশয়।

আমতা আঞ্চলিক কেন্দ্র

১২ অক্টোবর ২০২১, আমতা আঞ্চলিক কেন্দ্রে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে প্রায় ৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রক্তদান করেছিলেন।

কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক কেন্দ্র

এই কেন্দ্রে ছাত্রীদের নিয়ে ফার্স্ট এইড এবং হেলথ্ এডুকেশন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করা হল নভেম্বর ২০২১।

এরপর ৪র্থপাতায়

সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক সৈকত মন্ডল

বিশ শতকের চল্লিশের দশক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মজুতদারি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সাক্ষী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতা তার গতিপথ পরিবর্তন করে। উনিশ শতকের মধুসূদন দত্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী তিরিশ-চল্লিশের দশকে মার্কসবাদ তথা সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবি জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র উপর গভীর প্রভাব ফেলে। প্রকৃত পক্ষে চল্লিশের দশকে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ ও তার প্রতিক্রিয়া বাংলায় প্রগতি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় এবং প্রগতিপন্থী কবিদের জন্ম দেয়। এই কবিদের মধ্যে সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সরোজ দত্ত-র পাশাপাশি 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'-র স্রষ্টা সুকান্ত ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতার জন্ম শোষণ-বিরোধী ক্রোধকেই অবলম্বন করে। পরাধীনতার বেদনায় কাতর এই কবির কবিতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, মজুতদারি কালোবাজারী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় মুখর।

সাম্যবাদী কবি সুকান্ত ১৯২৬ খ্রীঃ কলকাতার কালীঘাটের ৪২ নং মহিম হালদার স্ট্রীটে জন্মগ্রহণ করেন মাতামহের গৃহে। বাবা নিবারণ ভট্টাচার্য ও মাতা সুনীতিদেবীর এই সন্তান মাত্র একুশ বছর বয়সে, ১৯৪৭ খ্রীঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস, মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল, গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি গ্রন্থগুলির মূল সূর প্রতিবাদী। রোমান্টিসিজম কিংবা প্রকৃতিপ্রেম নয়, সামাজিক ও মানবিক দায়বোধ কাজ করেছে, কবি সুকান্তর কাব্যচর্চার শিকড়ে।

ভারতে ১৯১৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড, আইন অমান্য আন্দোলনের ঘটনার পাশাপাশি ১৯২৫ খ্রীঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং এই পার্টি কর্তৃক কালোবাজারি ও মজুতদারীর বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি গঠনের কাজ চলেছিল। যদিও ১৯৩৪ খ্রীঃ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কমিউনিস্ট লীগ গঠন করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রগতিপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার লন্ডনে 'The Indian Progressive Writers Association' গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৩৬ খ্রীঃ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' লক্ষ্ণৌ-এ যাত্রা শুরু করে। প্রগতি লেখক সঙ্ঘ মূলতঃ দারিদ্র্য, ক্ষুধা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার দায়িত্বে ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রগতি লেখক সঙ্ঘের চিন্তা-ভাবনার তথা চৈতন্যের শরিক হয়ে বিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশের দশকে সমর সেন, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখের কলমে প্রতিবাদী-সত্ত্বার অনুরণন ধ্বনিত হয়।

মার্কসবাদে কমিটেড এই কবি নিজেকে দুর্ভিক্ষের কবি হিসাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জনতার কবি হওয়ার আকাঙ্খার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিম্নবর্গ (subaltern) এর মানুষকে যথা - শ্রমিক, কৃষক, বঞ্চিত, শোষিত প্রমুখ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ।

সুকান্তর 'সিঁড়ি', 'কলম', 'সিগারেট', 'দেশলাই কাঠি', 'চিল' প্রভৃতি কবিতায় সাম্যবাদী চিন্তা এবং শ্রেণীসংগ্রামের দিক প্রতিফলিত হয়েছে। অসম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন।

সুকান্তের কাব্য-প্রচেষ্টা শ্রেণীচেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ। আঞ্চলিক, জাতীয় সীমার ক্ষেত্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকতাবাদ লাভ করেছিল তার শ্রেণী-শোষণ বিরোধী চেতনা। পুঁজিপতি শ্রেণীকে আক্রমণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহমর্মিতা তাঁর কবিতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত। শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর বাস্তব চিত্র কবির নিম্নলিখিত বর্ণনায় এইভাবে পরিলক্ষিত হয় —

''অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ পেটানোর গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।''

['অনন্যোপায়' ঘুম নেই, পৃঃ ৮০]

শ্রমজীবী শ্রেণীর ব্যর্থতা, স্বপ্নভঙ্গের চিত্র উপরোক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে। আবার 'চারাগাছ' কবিতায় শ্রমিক শ্রেণীর বিদ্রোহ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যে সকল মানুষ আর্থ-সামাজিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, সেই সকল শোষিত শ্রেণীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন বিস্ফারিত হবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় জ্ঞাপন করেছেন কবি সুকান্ত তাঁর 'সিঁড়ি' কবিতায়। তাঁর এই 'সিঁড়ি' কবিতায় তিনি সিঁড়ি থেকে সম্রাট হুমায়ুনের পদস্খলনকে রূপকার্থে (metaphor) ব্যবহার করেছেন। এই কারণে যে, যখন সময়ের নিয়মে বঞ্চিত জনগণ রুখে দাঁড়াবে, তখন কিন্তু সুবিধাভোগী অভিজাতদের অট্টালিকা ভেঙে পড়বে। যে কারণে তাঁর 'সিগারেট' ও 'দেশলাই' কবিতা দুটি কিন্তু প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে। সেই জন্য কবির মুখে ধ্বনিত হয় —

''কবে আমরা জ্বলে উঠব -
সবাই - শেষবারের মতো!''

['দেশলাইয়ের কাঠি', ছাড়পত্র, পৃঃ ৪৪]

প্রকৃত পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে একদিকে যুদ্ধ ও অন্যদিকে মন্বন্তর মানুষকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বেড়াজালে আবদ্ধ করে। ক্ষুধা অবধারিতভাবে মানুষকে নির্মম ও নিষ্ঠুর করে তুলে অমানুষের স্তরে নামতে বাধ্য করে। আবার এই ক্ষুধার কারণে স্বদেশ ত্যাগ করে পরভূমে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কালে 'কথামুখ'-এ সুকান্ত সোচ্চারে ঘোষণা করেন ''১৩৫০ সাল সম্পর্কে কোন বাঙালীকে কিছু বলার চেষ্টা করা অপচেষ্টা ছাড়া আর কী হতে পারে? কেননা ১৩৫০ সাল কেবল মাত্র ইতিহাসের একটা সময় নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস, একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, শুধু তাই নয় ঘর ভাঙা গ্রাম ছাড়ার ইতিহাস।

একদিকে কবি 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় বিশ্বকবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন 'এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি'। অপরদিকে 'এই নবান্নে' কবিতায় তিনি সর্বহারাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে ভোলেননি। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভিক্ষ-তাড়িত এবং ক্ষুধা-যন্ত্রণায় কাতর মানুষের কাছে 'কবিতার স্নিগ্ধতার' কোন মূল্য যে থাকতে পারে না, সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সেই কারণে অবলীলায় কবি সুকান্ত বলতে পারেন পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল এক টুকরো রুটি তখন খাদ্য।

চল্লিশের দশকে দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, কালোবাজারী - মজুতদারী জনিত কারণে যে দেশব্যাপী খাদ্য-সঙ্কটের আবহ তৈরী হয় তার বিরুদ্ধে 'কলম', 'বিক্ষোভ', প্রভৃতি কবিতায় তিনি প্রতিবাদী চেতনা ব্যক্ত করেন।

''আর কালো কালি নয়,
রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে,
হে কলম আনো দিকে দিকে।''

ও'কলম', ছাড়পত্র, পৃঃ ৩২]

''ইতিহাস! নেই অমরত্বের লোভ,
আজ রেখে যাই আজকের বিক্ষোভ।''

['বিক্ষোভ', ঘুম নেই, পৃঃ ৭৩]

সংখ্যাগরিষ্ঠ সর্বহারা জনতার মুখে 'অন্ন' যোগানোর জন্য বিদ্রোহ শুধু কেন, বিপ্লবের আওয়াজ সর্বত্র যাতে ওঠে তা তিনি মনে-প্রাণে কামনা করেছেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, ''আগে আমি কমিউনিস্ট, তারপর আমি কবি''। তাই বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ায় তথা রুশ বিপ্লবের কারিগর লেনিন তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উৎস হয়ে ওঠেন। 'লেনিন' কবিতায় তিনি যখন বলেন — 'মনে হয় আমিই লেনিন' — তখন কিন্তু গরিষ্ঠ সর্বহারা মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাই।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, মন্বন্তর ছাড়াও শ্রমিক আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবী প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাবলী সুকান্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিশেষ আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবীতে ১৯৪৫ খ্রীঃ ২১ নভেম্বর ছাত্ররা যে মিছিল সংগঠিত করে, সেই মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিদ্রোহী সুকান্ত লেখেন '২১ নভেম্বর; ১৯৪৬' কবিতাটি।

সুকান্তভট্টাচার্যের রাজনৈতিক দর্শন এবং চিন্তাভাবনায় কেন্দ্রে আছে সর্বহারাশ্রেণী। অর্থাৎ রাজনীতি এবং কবিতাকে তিনি একটি ক্যানভাসে চিত্রিত করেছিলেন। তাই এটা বলতে দ্বিধা নেই যে, 'Art for art's sake' -এর জন্য নয় 'Art for life's sake' -ই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য-র সামগ্রিক সত্তার উৎস।

আঞ্চলিক কেন্দ্রের কর্মসূচী ..... ৩য় পাতার পর

মূল কেন্দ্রের খবর

নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ব্লাড ব্যাঙ্কের জরুরী আবেদনে সাড়া দিয়ে ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে মূল কেন্দ্রে ২৪ অক্টোবর ২০২১ একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান করলেন ২৬ জন। যাদের মধ্যে ছিলেন স্বপরিবারে একাধিক স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোমর কর্মী, তরুণ চিকিৎসক ও শিক্ষক।

বিশিষ্ট স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম সুহৃদ এবং লুম্বিনী পার্ক মানসিক হাসপাতালের অধীক্ষক ডাঃ বিশ্বজিৎ রায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাসপাতালের রুগীদের রক্ত গ্রুপ নির্ণয় করা হল। অনুষ্ঠানে কার্যকরী সভাপতি ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য নিজেই উপস্থিত থেকে গোটা কর্মকান্ডকে উজ্জীবিত করেন। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসূচী পুনর্মুল্যায়নের জন্যে চিকিৎসকদের সাথে একটি মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হল ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২১।

১১ ডিসেম্বর ২০২১ মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব ২০২১

বর্তমান পরিস্থিতিতে উৎসব ২০২১ অনলাইন মাধ্যমে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক অনেক আঞ্চলিক কেন্দ্র এখনও উৎসব করে উঠতে পারেননি। তবু বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। যাদের মধ্যে আছে কোচবিহার (২৩, ২৪ ডিসেম্বর ২০২১); কাটোয়া (১৯ ডিসেম্বর, ২০২১); কাকদ্বীপ (২৬ ডিসেম্বর ২০২১)। এখনও মাসখানেক সময় আছে, অনেকগুলি কেন্দ্রে উৎসব প্রক্রিয়া চলছে, আশা করি জানুয়ারী ২০২২-র মধ্যে চূড়ান্ত হবে।

স্টুডেন্টস্ হেলথ্ হোম-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ পবিত্র গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত এবং মডার্ণ গ্রাফিকা, ৪১, গোকুল বড়াল স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৯৮৩১৮৫১৮৯৭